সহজ সাধন

স্বামী গৌতমানন্দ

পরমপূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলে দিয়েছেন, জীবনের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য। একটি 'আত্মনো মোক্ষার্থং', অপরটি 'জগদ্ধিতায়'। শাস্ত্রমতে আমাদের জীবনে চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখে প্রথম তিনটি আমরা করে থাকি। আমরা ধর্ম করতে চাই, যা পালন করে মোক্ষে পৌঁছতে পারি। সাধু বা ভক্ত যে-কেউ ধর্ম দ্বারা সোজা মোক্ষে পৌঁছতে পারেন, আবার কেউ ধর্ম-অর্থ-কাম পালন করে অর্থাৎ সারা জীবনটি অতিবাহিত করে বানপ্রস্থ জীবনযাপন করেন। সকলেরই উদ্দেশ্য মোক্ষ।

বিশেষত সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনের প্রধান কাজই 'আত্মনো মোক্ষার্থম্'। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—যিনি পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। স্বামীজী ব্রহ্মবিদ। স্বামীজীকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণই মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণকে পরমাত্মা মনে করি। যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে যায়—এই চিন্তা করতে করতে আমরাও তা-ই হয়ে যাব। আমাদের

ভেতর পরমাত্মা আছেন, আমরা ঈশ্বরের অংশ, তাঁর সন্তান, তাঁর ভক্ত—এইভাবে ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে আমরা অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ পাব। এই উদ্দেশ্যটিই, এই আদর্শটিই স্বামীজী আমাদের সামনে রেখেছেন। দ্বিতীয়ত, আমরা শুধু নিজের জন্য জপধ্যান করব, ইচ্ছে হলে আশ্রম ছেড়ে তপস্যা বা তীর্থ করতে চলে যাব তা হবে না। যে-সমাজে বাস করি, সেখানকার মানুষজনের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। আমাদের যার যা আছে তা অপরের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে হবে। যার টাকা আছে, সে যেমন নিজে ভোগ করবে, তেমন অপরকেও ভোগ করাবে। তেমনই যার বিদ্যা আছে সে তা দান করবে। আমাদের সবকিছুই আমরা নিজেদের জন্য যেমন, তেমনই অপরের সেবায় ব্যবহার করব। স্বামীজী যে ঠাকুরের উপদেশ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র অপূর্ব আদর্শ কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা আজ সত্যিই এক মাইলস্টোন। সেবা অনেকেই করেছেন, আজও করেন, কিন্তু সেসব ছিল সামাজিক কাজের অঙ্গস্বরূপ। দরিদ্র মানুষের উপকার করছি, তাদের উদ্ধার করছি—যারা সেবা করছে তাদের মধ্যে এই বোধ কাজ করত। কিন্তু ঠাকুর-স্বামীজী বলেছেন, তুমি কারও উপকার করতে পার না, সাহায্য করতে পার না। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সাহায্য করেন। তাঁরই তো সন্তান সবাই। তিনি সকলকে দেখেন। তাহলে আমাদের করণীয় কী? আমাদের যা ভাল আছে তাই দিয়ে অপরের সেবা করতে পারি। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে যা কিছু—সুখ, শান্তি, আনন্দ পাব তা অপরের ভালর জন্য দেব। কীভাবে? আমরা ঠাকুরের নাম করে, ধ্যান-ভজন করে শান্তি পেয়েছি, আনন্দ পেয়েছি, সমাজকেও ওই অভিমুখে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। সংসারে থেকেও সাধ্যমতো জপধ্যান, সৎসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ পাঠ—এসব করে ক্রমশ আত্মিক উন্নতি ঘটবে এবং শেষে সকলেই মোক্ষ লাভ করতে সমর্থ হবে।

স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর একটি বই আছে 'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন'—সেখানে মহারাজ বলছেন, ধ্যানজপ করেও অপরের কল্যাণ সাধন করা যায়। নিজে যে-আনন্দ, শান্তি পেয়েছি তা অপরের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া যায়। যারা রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন চেনে না, তাদের কাছেও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কথা বলা যায়। এসব বই পড়ে, এঁদের জীবন জেনে আমি উপকৃত হয়েছি, তোমরাও জানলে তোমাদেরও ভাল হবে, আধ্যাত্মিক কল্যাণ হবে—এও এক ধরনের সেবা। একে গুরুগিরি বলে না—অপরের কল্যাণের কথা ভেবে যাই করা যাক না কেন তা সেবা। কথা এবং জীবনের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য থাকে, কোথাও ফাঁক না থাকে তাহলে সেই কথার একটা জোর থাকে। সে-কথা মেনে চললে অপরেরও কল্যাণ হয়।

সাধু-গৃহী সকলের কর্তব্য অপরের জন্য কিছু করা। আমরা সাধুরা অপরের জন্য কাজ করেই থাকি। কোনও কোনও সাধু এত পরিশ্রম করেন, দেখে মনে হয়, বাবারে কত খাটছে। কিন্তু তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, দেখা যাবে তিনি খুব আনন্দে আছেন। অনেক গৃহস্থ এসে আমার কাছে জানতে চান, ''মহারাজ আমরা একটু কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আর আপনারা ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করেন কী করে?'' তাঁদের বলি, ''আমাদের কাজ তো কাজ নয়, আমরা সেবা করি। যা কিছুই করি সবই ঠাকুরের সেবা। তাই কাজ করে আমরা কখনও ক্লান্ত হই না, আনন্দিত হই।''

আমরা ঠাকুরের হাতের পুতুল একথা মনে রাখলে বলতে পারব—প্রভু তুমিই সব করাচ্ছ। তাহলে আমাদের অহংবোধ—'আমি আমি'—মাথা তুলতে পারবে না। অনায়াসে বলতে পারব—ঠাকুর তুমি যেমন খেলাচ্ছ তেমনই খেলছি। ভাল কাজ করলে যেমন সকলে ভাল বললে মনে করি—প্রভু তুমি ভাল করিয়েছ তাই ভাল হল, তেমনই ভুল হয়ে গেলেও মনে করতে হবে—প্রভু তুমিই ভুল করিয়েছ। এইভাবে ভাবতে ভাবতে আমিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। যদি ভাবি ঠাকুরের কাজ ঠাকুর করিয়েছেন তাহলে আর অহংকার হয় না। ধীরে ধীরে এটি অভ্যাস হয়ে গেলে যত বড় কাজই করি না কেন মনে হবে—প্রভু এতবড় কাজ তুমি করিয়ে নিলে! 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।' যত বড় বড় মহারাজরা, প্রেসিডেন্ট মহারাজরা প্রত্যেকে কত কাজ করেছেন। কিন্তু সকলেই জানেন, ঠাকুর করিয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে।

যে ভালবাসে সে যে সবসময়েই ভালবাসবে তা নাও হতে পারে। আমার কল্যাণের জন্য, ভালর জন্য আমাকে আঘাতও করতে পারে। মা যেমন সন্তানকে ভালবাসেন তেমন শাসনও করেন। তাই শিশু মায়ের কাছে মার খেলেও, বকুনি খেলেও আবার তাঁর কাছেই ছোটে। কারণ শিশুও জানে, মা-ই তাকে খাওয়ায় পরায়, ভালবাসে। কিন্তু বাইরের কেউ এসে শিশুকে মেরে গেলে সে সারাদিন কাঁদতে থাকে আর মাকে বলতে থাকে—ও আমাকে মেরেছে, তুমি গিয়ে ওকে মেরে এসো। সারাদিন সে ভুলবে না। তেমনই, প্রভুর কাজ আমরা করছি, সেই কাজ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট আসে, তা আমরা জয় করতে পারি। ঠাকুর সব পার করে দেন। ঠাকুরের কাজে এরকমই আনন্দ।

আত্মনো মোক্ষার্থং—নিজের জন্য জপ, ধ্যান, পড়াশোনা সবকিছু; সেগুলোই যখন অপরের জন্য করব তা হয়ে যাবে জগদ্ধিতায়। স্বামীজী বলেছেন, ''খালি পেটে ধর্ম হয় না।'' আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত মানুষ ক্ষুধার্ত তাদের অন্নের ব্যবস্থা করতে হবে, যাদের শিক্ষার প্রয়োজন তাদের শিক্ষা দিতে হবে। এইভাবে তারা যখন এসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে তখন তাদের ধর্মের কথা বললে তা কাজে আসবে। তারা নিজেরাও এব্যাপারে সচেতন হবে, আধ্যাত্মিক পথে আসবে, অনন্ত আনন্দের অধিকারী হবে। স্বামীজীর সময় পঞ্চাশ জন থেকে আজ আমরা দুহাজার হয়েছি, আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরে সেই সংখ্যা কুড়ি হাজার-ত্রিশ হাজার হবে, তারপরে তা দু-লক্ষ হবে। হবেই হবে। স্বামীজীর আশীর্বাদ আছে।

এই মঠ ঠাকুরের শরীর। এই এত কাজ যে চলছে তা কি মানুষের সাধ্য! ঠাকুরই করাচ্ছেন। ঠাকুরকে আমরা না দেখতে পেলেও তিনিই মঠ-মিশনের প্রতি শাখায় কাজ করে চলেছেন। আমরা যেখানে যেভাবেই সাহায্য করি না কেন তা ঠাকুরেরই সেবা। আর যারা মঠ-মিশনের বিরোধিতা করছে তারা ঠাকুরেরই বিরোধিতা করছে, তাদের ইহকাল পরকাল দুই-ই যাবে।

শাস্ত্রে আছে গুরুর কাছে থাকতে হবে। কিন্তু আমরা গুরুকে সবসময় কোথায় পাব? হয়তো গুরু বেলুড় মঠে আছেন, অথবা শরীরে নেই। তাহলে উপায়? স্বামীজী এর সমাধান করে দিয়েছেন। এই সঙ্ঘই ঠাকুরের শরীর। তাই আমরা যে-কেন্দ্রেই থাকি না কেন ঠাকুরের সঙ্গেই আছি, গুরুর সঙ্গেই আছি। এই জেনে তাঁর সেবা যত আমরা করতে পারব আমাদেরই উন্নতি হবে।

১৩